জামাই রহস্য

জহর সরকার

এই দিনটাতে আমার মা তাঁর চঞ্চল ছেলেমেয়েদের শীতলপাটিতে বসিয়ে শোনাতেন, কী ভাবে মা ষষ্ঠী সমস্ত শিশুদের মঙ্গল করেন, তাদের দীর্ঘ জীবন দেন। তিনি কয়েকটি মন্ত্র পড়ে একটা অদ্‌ভুত দেখতে দূর্বাঘাসের ছোট্ট চামর দিয়ে আমাদের গায়ে মাথায় পুণ্যবারি ছিটিয়ে আশীর্বাদ করতেন, মুঠো ভরে ফলমূল দিতেন। বিয়ের পরে আমার বনেদি ঘটি শ্বশুরবাড়িতে দেখলাম, ওঁরা আমার মায়ের সন্তান-ষষ্ঠীকে একটা নিতান্ত বাঙাল ব্যাপার বলে মনে করেন, তাঁদের কাছে এটা একেবারেই জামাইয়ের দিন। আমার অবশ্য তাতে কোনও সমস্যা ছিল না, কারণ আমার শাশুড়ি সে দিন আমার পাতে অন্তত পাঁচ-ছ'রকমের মাছ-মাংস এবং সমানসংখ্যক মিষ্টি সাজিয়ে খেতে বসাতেন। কব্জি ডুবিয়ে তার সদ্ব্যবহার করতাম।

ভাবতাম, দুই বাংলার দুই ধারা কেন? পরে যখন সামাজিক ইতিহাস ও ধর্মীয় রীতি সম্পর্কে গবেষণায় ডুব দিলাম, তখন পরিষ্কার হল, পোশাকি হিন্দুধর্মের গভীরে একটা প্রবল লোকরীতি কী ভাবে বেঁচে থাকে। যেটা সবচেয়ে মজার লেগেছিল সেটা হল, মা ষষ্ঠী নিছক বাংলার এক গ্রামদেবী নন, শীতলা ও মনসার মতোই তিনিও ভারতের নানা অঞ্চলে পূজিত হন। এক শতাব্দী আগে উইলিয়ম ক্রুক লিখেছিলেন, 'লোকসমাজে প্রচলিত নানা প্রথা ও রীতি নিয়ে যত চর্চা করা যায়, ততই হিন্দুধর্মের উত্‌সের কাছে পৌঁছনো যায়।'

আশুতোষ ভট্টাচার্য লোকায়ত ধর্ম নিয়ে বিস্তর কাজ করেছিলেন। তাঁর মতে, ষষ্ঠী হলেন প্রসূতি এবং শিশুর রক্ষয়িত্রী। অন্য দিকে, নৃতত্ত্ব ও ইতিহাসের পণ্ডিত সুধীর রঞ্জন দাস এই অভিভাবক দেবীর জনজাতীয় উত্‌সের সন্ধান করেছিলেন। আবার হরপ্পাতেও প্রাগৈতিহাসিক এমন দেবীমূর্তি পাওয়া গেছে, যা দেখে নৃতত্ত্ববিদরা মনে করেছেন, সিন্ধু সভ্যতাতেও ষষ্ঠীর আরাধনা চলত। এটা মানলে তো আমরা সোজা চার হাজার বছর পিছিয়ে যেতে পারি এবং সে ক্ষেত্রে আমাদের মতো লোভী জামাইদের এই গ্রাম্য দেবীটিকে আর একটু শ্রদ্ধার চোখে দেখা উচিত। তবে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, সন্তান জন্মের সঙ্গে প্রাচীন লোকবিশ্বাসে 'ম্যাজিক'-এর যে যোগাযোগ ছিল, ষষ্ঠীর পুজো তার অনুসারী। জন মারডক, সি এইচ বাক-এর মতো গবেষকরা দেখিয়েছেন, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কী ভাবে মেয়েরা ষষ্ঠী বা তাঁর অনুরূপ দেবীর আরাধনা করতেন। উইলিয়ম জোনস নাকি এই রীতির সঙ্গে প্রাচীন ইউরোপের লোকাচারের মিল দেখে চমত্‌কৃত হয়েছিলেন।

একটা গল্প মায়ের মুখে শুনেছি, সেটা নাকি পশ্চিম ভারতেও প্রচলিত। একটি যৌথ পরিবারের ছোট বউ রোজ খাবার চুরি করত আর একটা কালো বেড়ালের নামে দোষ দিত। বেড়ালটা এর প্রতিশোধ নিতে সেই বধূটির বাচ্চা হলেই তাকে তুলে নিয়ে মা ষষ্ঠীর কাছে রেখে আসত। বধূটি তা জানতে পেরে দেবীর কাছে মার্জনা ভিক্ষা করল। মা ষষ্ঠী তাকে ক্ষমা করলেন, কিন্তু বললেন, এই দিন তাঁর পুজো করতে হবে এবং কালো বেড়ালকে তাঁর বাহন হিসেবে সম্মান করতে হবে। ভারতবাসীর তাই কালো বেড়ালকে অশুভ মনে করার কোনও কারণ নেই। প্রধানমন্ত্রীকে যাঁরা পাহারা দেন, তাঁদেরও তো ব্ল্যাক ক্যাট বলা হয়!

কেউ যাতে নিজের প্রাপ্যের বেশি ভাগ না নেয়, যৌথ পরিবার ধরে রাখার পক্ষে সেটা খুব জরুরি। মা ষষ্ঠীর কাহিনি সেই শিক্ষা দেয়। ভারতে এই লোককাহিনিগুলি কী ভাবে অনেক শতাব্দী ধরে তাদের পুরনো চেহারায় বেঁচে রইল, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম তাদের বিনাশ করল না, সেটা সত্যিই অবাক করে দেয়। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম মা ষষ্ঠীকে আত্মসাত্‌ করতে চায়নি তা নয়, খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে হিন্দু যুদ্ধদেবতা স্কন্দ ও তাঁর সহযোগী যৌধেয়র সঙ্গে

ষষ্ঠীকে জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। খ্রিস্টীয় প্রথম থেকে তৃতীয় শতকের মধ্যে বিভিন্ন শাস্ত্রে, বিবরণে এবং মুদ্রায় তাঁর ছ'টি মাথা দেখানো হয়েছে। পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীতে গুপ্তযুগেও এই মূর্তির বর্ণনা পাই। পঞ্চম শতকের বায়ুপুরাণে ষষ্ঠী ৪৯টি দেবীর অন্যতম, আর একটি পুরাণে তাঁকে 'সমস্ত মাতৃদেবীর মধ্যে আরাধ্যতমা' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীর যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে তিনি স্কন্দদেবের পালিকা-মা ও রক্ষয়িত্রী, কিন্তু পরবর্তী রচনায় তাঁর সঙ্গিনী, পদ্মপুরাণেও তিনি স্কন্দের স্ত্রী। ষষ্ঠীর কাহিনিগুলি পাওয়া যায় বাংলায় মঙ্গলকাব্যে, বিশেষ করে ষষ্ঠীমঙ্গল-এ, যেখানে সর্পদেবীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। বিহারে সন্তানজন্মের পরে ছ'দিনের অনুষ্ঠানটিকে ছ'ঠী বলা হয়, ষষ্ঠী সেখানে ছ'ঠী মাতা, সন্তানহীনা দম্পতিরা তাঁর আরাধনায় ব্রত পালন করেন, ষষ্ঠী ব্রত। ওড়িশায় সন্তানজন্মের ছ'দিন এবং একুশ দিনে এই দেবী পূজিত হন। উত্তর ভারতের কোথাও কোথাও বিয়ের সময়েও ষষ্ঠীর পুজো করা হয়।

ষষ্ঠীকে দেখি সাধারণত জননী রূপে: মার্জারবাহিনী, কোলে এক বা একাধিক শিশু। তাঁর নানান প্রতীক: মাটির কলসি, বটগাছ, বটগাছের নীচে লাল পাথর, ইত্যাদি। খোলা আকাশের নীচে কোনও একটা জায়গা তাঁর পুজোর জন্য নির্দিষ্ট হয়, তার নাম ষষ্ঠীতলা। মনে রাখতে হবে, এই সে দিন পর্যন্ত শিশুমৃত্যুর হার খুব বেশি ছিল। নবজাতককে রক্ষা করার জন্য মানুষ তাই ষষ্ঠীর শরণ নিত। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক হিন্দুধর্ম তাঁকে পৌরাণিক দেবীতে রূপান্তরিত করতে চাইল, লোকধর্ম চাইল পুরনো আচার বজায় রাখতে, ফলে টানাপড়েন চলল। টানাপড়েনের আর একটা চেহারাও দেখা গেছে। ষষ্ঠীকে বলা হয়েছে অমঙ্গলের দেবী, তিনি কুপিত হলে মা ও শিশুদের দুঃখ দেন। পঞ্চম শতকের কাশ্যপ সংহিতায় ষষ্ঠীকে বলা হয়েছে 'জাতহরণী', যিনি মাতৃগর্ভ থেকে ভ্রূণ অপহরণ করেন, সন্তান জন্মের ছ'দিনের মধ্যে তাকে ভক্ষণ করেন, তাই শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে ষষ্ঠ দিনে তাঁকে পুজো করা বিধেয়।

কিন্তু এ-সবের মধ্যে জামাই ঢুকল কী করে? জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণপক্ষে সাবিত্রী চতুর্দশীতে স্ত্রীরা স্বামীর দীর্ঘজীবন কামনা করে যমের আরাধনা করেন। মনে হয়, এই লোকাচারটির সূত্র ধরেই কলকাতার বাবু সংস্কৃতি এই ষষ্ঠীটি জামাইকে নিবেদন করেছিল। আঠারো-উনিশ শতকে বাংলার সচ্ছল শ্রেণির মধ্যে বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহের ব্যাপক প্রচলন হয়, ফলে অগণিত বালবিধবার যন্ত্রণাময় জীবন, বিস্তর সতীদাহ। এই অবস্থায় জামাই ও স্বামীর দীর্ঘ জীবনের প্রার্থনা বাঙালি মা এবং মেয়ের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। অন্তত কলকাতা ও চার পাশের এলাকায় সন্তানের মঙ্গলকামনার চেয়ে এর গুরুত্ব বেশি ছিল।

যখনই নতুন সংকট আসে, তার মোকাবিলার নতুন চেষ্টাও দেখা যায়। ইতিহাসে বার বার দেখেছি, যুগের প্রয়োজনে সমাজ কী ভাবে পুরনো আচার-অনুষ্ঠানগুলি সংশোধিত করে নেয়। ষষ্ঠী সন্তানের কল্যাণের জন্য পালনীয় একটি ব্রত, কন্যার ভবিষ্যত্ নিয়ে উদ্বিগ্ন বাঙালি মা অন্তত একটি ষষ্ঠীকে পালটে নিয়েছেন, জামাইয়ের জন্য ভূরিভোজের আয়োজন করেছেন।

প্রসার ভারতীর কর্ণধার, মতামত ব্যক্তিগত।